The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 25-42, ISSN 2306-3920

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম : শামছুল হকের অংশগ্রহণ

শেখ ফরিদ*
মীর ফেরদৌস হোসেন**

[**সার-সংক্ষেপ :** ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্মের মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস ও সংঘাতের যে বীজ ইংরেজ শক্তি বপন করেছিল তা ক্রমশই বৃদ্ধি পায় যা শেষভাগে রূপান্তরিত হয় রক্তক্ষয়ী সংঘাতে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে মুক্তির জন্য যারা ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে শামছুল হক [শামছুল হক (১৯১৮-১৯৬৫)] একজন অন্যতম বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি রাজনীতিবিদ। বর্তমান টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার মাইঠাইন গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এই রাজনৈতিক নেতা সা'দত কলেজসহ দেলদুয়ার ও সদর টাঙ্গাইলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। রাজনীতি সচেতন পরিবারের সদস্য হিসেবে স্কুল জীবন থেকেই সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রসমূহে যুক্ত হন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর জীবনের উপজীব্য হয়ে ওঠে রাজনীতি। আদ্যন্ত ঢাকাকেন্দ্রিক নাতিদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সংঘটিত সকল আন্দোলন সংগ্রামে তিনি ছিলেন নেতৃত্ব দানকারি অন্যতম সংগঠক। তিনি একাধারে পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্য, গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ যার পরিবর্তিত পরিচিতি। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগকে গণসংঠনে পরিণত করেছিল যে কর্মীশিবির, তিনি তাঁর প্রাণপূরুষ ছিলেন। ১৫০, মোগলটুলির এই কর্মীশিবির থেকেই পরবর্তীকালে ছাত্রলীগ জন্মলাভ করে। শামছুল হকের নেতৃত্বে প্রধানত কর্মীশিবিরের কর্মপ্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতবর্ষের মাঝে শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই মুসলিম লীগ একক সরকার গঠন করে। প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৯০% প্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন হয়, মুসলিম অধ্যুষিত প্রায় সকল আসনে মুসলিম লীগের জয়লাভের কারণেই জিন্নাহ মুসলিম লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

* **শেখ ফরিদ :** পিএইচ.ডি গবেষক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
** **ড. মীর ফেরদৌস হোসেন :** অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

করতে সক্ষম হন এবং কংগ্রেস ভারত বিভাগ মেনে নেয়। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত বিভক্তির সময় সমৃদ্ধ সিলেট অঞ্চল পাকিস্তানভূক্ত হয়েছিল কর্মীশিবিরের অক্লান্ত পরিশ্রমে। বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় শামছুল হকের মত রাজনৈতিক ব্যাক্তির মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে, বয়স আর অভিজ্ঞতা বিবেচনায় তিনি যথেষ্ট পরিপক্ক ছিলেন না। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে তৎপরবর্তী রাজনীতিতে অগ্রবর্তী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সৌভাগ্যক্রমে শামছুল হকও বয়সের সীমা অতিক্রম করে একজন তরুন মুসলিম লীগার হিসেবে এই পর্ব থেকে শুরু করে মুসলিম লীগ সংগঠনে, নির্বাচন তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সার্বিক কার্যক্রমে প্রগতিশীল অংশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অখণ্ড বাংলা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, আসাম গনভোটসহ পাকিস্তান আন্দোলনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ সংগঠনের মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ শামছুল হকের অবস্থান আবুল হাশিমের অনুগামী ঢাকা কেন্দ্রিক রাজনীতির শীর্ষস্থানীয় সংগঠকের।]

ভূমিকা

অন্তর্গত চাহিদার তাগিদে বাংলাকে নিয়ে যারা ভাবতেন তাঁদের মধ্যে উনিশ শতকের শুরুতেই এক মহান নবচেতনার প্রকাশ সূচিত হয়। রামমোহন-ডিরোজিওর কালে এই নবচেতনা ছিল বহুলাংশে স্বগত সত্তার, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের কালে তা এসে উত্তীর্ণ হয় সচেতন সত্তায়। নবচেতনার ফলে প্রথমে ঘটে বৌদ্ধিক জাগরণ, তারপর গণজাগরণ। গণজাগরণের ধারায় প্রস্ফূটিত হয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বৌদ্ধিক জাগরণ থেকে শুরু করে গণজাগরণ পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রয়াস যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিরোধ ও স্বাতন্ত্র্যেরও বিকাশ। (হক, ২০১৫ : ১)

নানা ঐতিহাসিক কারণে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনায় আর্থ-সামাজিক দিক থেকে প্রাগ্রসর ছিল। জাগরণের ধারায় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের বিভেদনীতির (Devide and rule) মাধ্যমে ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠে। সৃষ্টি হয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। এর ফলে এক পর্যায়ে রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের স্থলাভিষিক্ত হয় সাম্প্রদায়িকতা। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরি-বাকরি থেকে শুরু করে জীবনমান উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায় পিছিয়ে পড়ার ফলে পরবর্তীকালে ইংরেজদের মত হিন্দুরাও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা এ এফ সালাহউদ্দিন আহমদ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বলেন :

> "The different reactions of Hindus and Muslims to English rule and western education profoundly affected the subsequent development of the two communities. While the Hindus in general welcomed the English rule with enthusiasm the Muslims regarded it as a calamity. The failure of the Muslims to adjust themselves to the new situation not only bought about a sharp deterioration in their position from which they took a long time to recover; it also widened the golf between the two communities. In fact, Muslim separatist feeling which led to powerful nationalist movement in the twentieth century and eventually created Pakistan, may be traced to this period. "(Ahmed, 2013 : 17)

অনেকটা এরই ফলে ইংরেজদের 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতিটি অধিকতর কার্যকর হয়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারত শাসনের ক্ষেত্রে সবসময়ই হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করবার নীতি গ্রহণ করেছেন। বিভক্ত করে শাসন করা সাম্রাজ্যবাদীদের একটা সাধারন নীতি এবং এই নীতির সাফল্যই পরাজিতের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় না, অন্তত: এতে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। একে অবজ্ঞা করে এ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন না করা চিন্তার ত্রুটি মাত্র (নেহরু, ২০১৪ : ১৩৪)।

সাবধানতার প্রয়োজন হলেও কোন রাজনৈতিক দলই সাবধানতা অবলম্বন করেনি, না কংগ্রেস না মুসলিম লীগ। হিন্দু মহাসভার মত সাম্প্রদায়িক শক্তিকেও তাঁরা নিজ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছে, কেউ ব্যবহার করেছে চাপ সৃষ্টি করার জন্য আবার কেউবা চাপের প্রতিক্রিয়ার নিজ সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করার কৌশল হিসেবে। মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে দলীয় অধিবেশন আহবান করা হয়। অধিবেশনে ২২শে মার্চ জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্ব বিশদভাবে ব্যক্ত করেন। সেই সাথে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে মুসলিম লীগ। 'লাহোর প্রস্তাব' নামে ইতিহাস খ্যাত এই সাংবিধানিক প্রস্তাবাবলী ২৩শে মার্চের অধিবেশনে গৃহিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় :

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, নিম্নরূপ মৌলিক নীতিগুলি অন্তর্ভূক্ত করা না হলে কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর করা যাবে না বা মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যেমন: ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে এমনভাবে চিহ্নিত করে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির সমন্বয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা যায়, যেখানে প্রত্যেকটি ইউনিট হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত (রহমান, ১৯৮২ : ২)। প্রস্তাবটির খসড়া তৈরি করেন সিকান্দার হায়াত খান, সামান্য সংশোধনীসহ তা উপস্থাপন করেন এ কে ফজলুল হক এবং সমর্থন করেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের পটভূমিকায় জিন্নাহ বলেন :

> The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs, and literatures. They neither intermarry not interline together and indeed, they belong to two different civilizations which are based mainly on conflicting ideas and conceptions. Their outlook on life are different. (Philips, 1962 : 354)

এই সম্মেলন মুসলিম লীগারদের জন্য বিশেষ মর্যাদার। পূর্ববঙ্গের ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে শামছুল হক লাহোর অধিবেশনে যোগদান করার বিরল সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন এখানকার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য (সেন, ১৯৯৭ : ৩৭২)। মননে স্বদেশি আন্দোলনের ছবি আঁকা মুসলিম বাঙালি শামছুল হক এর নিকট সময়ের উপযোগিতায় পাকিস্তান অর্জন বিশাল কর্মযজ্ঞে রূপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য যে, লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান আন্দোলনের মূলভিত্তি হলেও মুসলিম লীগের কার্যবিবরণীতে অথবা মুসলিম লীগ নেতাদের বক্তব্যে পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ করা হয়নি। প্রস্তাবের তাৎপর্য অনুধাবন করে ভারতীয় পত্র পত্রিকাগুলি একে 'পাকিস্তান ঘোষণা' রূপে উল্লেখ করে। বাংলায় হিন্দুদের একচেটিয়া মালিকানাধীন কলকাতার সাময়িক পত্রিকাগুলি লাহোর প্রস্তাবের নামকরণ করে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' (আহমেদ, ২০১৪ : ৫০, ৫১)। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবী সম্বলিত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব (লাহোর প্রস্তাব) গৃহীত হবার পর মুসলমানদের চিন্তাধারায় নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। লাহোর প্রস্তাবই মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে গোটা ভারতের রাজনৈতিক দাবীর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে, মুসলিম লীগের স্বাধীনতা বিরোধী তকমা মুছে স্বাধীনতার দাবীদার গণসংগঠনে পরিণত হবার পথ রচিত হয়। পাকিস্তান অর্জন মুসলিম লীগের মূলমন্ত্র ও একমাত্র কর্মসূচি হিসাবে বিবেচিত হয় (আহমদ, ২০০৬ : ১৪৭)।

১৯৪৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত লীগ হাই কমান্ড পাকিস্তান পরিকল্পনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা প্রকাশ না করলেও বাঙালি মানসে লাহোর প্রস্তাব ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী বলে গণ্য হয়। স্বাধীনতা ও অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধির সম্ভাবনা লক্ষ্য করে এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ পশ্চাদপদ মুসলিম জনগোষ্ঠী লাহোর প্রস্তাবের একনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত হয়, মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী শামছুল হক ছিলেন এই জনমত সৃষ্টির অন্যতম কারিগর, অন্যান্য সংগঠকদের অনুরূপ তিনি লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী ভারত বিভক্তিকে গণতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিকল্পহীন পথ বলে মনে করতেন। এসময় এইচ এস সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম সহ এতদঞ্চলের মুসলিম লীগ কর্ণধারদের সাথে তাঁর পরিচিতি ঘটে এবং উপরোক্ত প্রস্তাবের পক্ষে জনমত সংগঠনে মাঠে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। (কবীর, ১৯৯২ : ২১) অতি অল্প দিনের মাঝে তিনি আবুল

হাশিমের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন, আবুল হাশিম তাঁর মাঝে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা আবিষ্কার করেন।

১৯৪৩ সালের ৮ই নভেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় আবুল হাশিম বলেন, "বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তিন স্থানে বন্ধক রয়েছে, স্যার সলিমুল্লাহর সময় থেকে 'নেতৃত্ব' বন্ধক আছে আহসান মঞ্জিলে, 'প্রচার' বন্ধক রয়েছে দৈনিক আজাদের মালিকের কাছে আর 'আর্থিক' বন্ধক রয়েছে ইস্পাহানীর নিকট(*মিল্লাত*, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৭ : ২)। শামছুল হকসহ মুসলিম লীগের অপেক্ষাকৃত তরুণ ও উদ্যোগী-উদ্যমী নেতৃত্বের ভূমিকা'র ফলে এইসব কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল মুসলিম লীগ। একই বক্তৃতায় তিনি পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং মুসলিম লীগকে সর্বস্তরের মুসলিম জনগণের সংগঠনে পরিণত করারও সংকল্প ব্যক্ত করেন (Sen,1976 : 185)। সেই সংকল্প বাস্তবায়নে সর্বস্তরের কর্মীবাহিনী যথযথ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রসর হয় শামছুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা অঞ্চলে।

তার প্রচেষ্টা ও আহবানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হয় এবং ক্রমশ মুসলিম লীগের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। তার অসাধারণ সাংগঠনিক কর্মকুশলতায় ও ফলপ্রসু পদক্ষেপে বাংলায় মুসলিম লীগের একটি সুশিক্ষিত ও নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী গড়ে উঠে। ছাত্র-যুবকদের নিয়ে গঠিত এ কর্মী বাহিনীর সহযোগিতায় লীগ সংগঠনকে তিনি প্রদেশের সর্বোচ্চ স্তর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর আবুল হাশিম এর আমূল সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। আগে নিজে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর ও স্থায়ী তহবিল পূণর্গঠন করেন এরপর মাঠ পর্যায়ের সংগঠন পূণর্বিন্যাসে মনোনিবেশ করেন। মাঠ পর্যায়ের সংগঠন গুছাতে সৌখিন কর্মীর পরিবর্তে সার্বক্ষণিক কর্মী সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেন। প্রচারণায় আনেন নতুনত্ব। ইসলামের প্রকৃত আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে মুসলিম জাতীয়তাবাদী সংগঠনে রূপ দিতে এবং এর মাধ্যমে মুসলিমদের সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত করতে উদ্যোগী হন। (সুলতানা, ১৯৯৬ : ৪৩)

ঢাকায় অবস্থানকালে আবুল হাশিম পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে লীগ সংগঠনকে আরো সুদৃঢ় করা এবং ঢাকা জেলা লীগকে খাজাদের প্রভাবমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি সুবিধাজনক স্থানে মুসলিম লীগ অফিস ও পার্টি হাউজের জন্য বাড়ি ভাড়া করার নির্দেশ দেন। তাঁর এ নির্দেশ অনুয়ায়ী ১৯৪৪ সালের ১ এপ্রিল প্রাদেশিক লীগের শাখা অফিস হিসেবে চক মোগলটুলির ১৫০ নম্বর ত্রিতল বাড়ির দোতলা ও তিন তলা ভাড়া নেয়া হয়। দোতলায় অফিস ও তিনতলায় কনফারেন্স রুম ও কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। দলীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে শামছুল হক, শামসুদ্দিন আহমদ, মোহম্মদ

শওকত আলী এবং আমীর আলী নিয়োজিত হন। ঢাকা জেলা লীগ, ঢাকা সিটি লীগ, ঢাকা সদর মহকুমা লীগ ও ঢাকা জেলা জনরক্ষা কমিটির অফিসের জন্য কক্ষ বরাদ্দ করা হয়। নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের জন্য পার্টি হাউজে অবস্থানের সুযোগ রাখা হয়। (A.T.M Atiqur Rahman, 1997 : ২৩-২৬) ঐ সময়ের নেতৃত্ব সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের মূল্যায়ন :

> শুধু কর্মী শিবির বা মুসলিম লীগ নয় শহীদ নযির আহমদ নিহত হবার পর ঢাকায় ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন জনাব শামছুল হক সাহেব, শামসুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। এরা সকলেই সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত ছিলেন। পরে হাশিম সাহেবেরও ভক্ত হন। মুসলিম লীগকে কোটারি স্বার্থের কবল থেকে মুক্ত করেন। আবুল হাশিমের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ১৫০ মোগলটুলি অফিসের সার্বক্ষণিক কর্মী ছিলেন শামছুল হক, তাঁর উপরই পুরো ভার বর্তায়। পাকিস্তান আনতে ব্যর্থ হলে লেখাপড়া করে কোন লাভ হবে না এই প্রত্যয় আমাদের তৈরি হয়েছিল। (রহমান, ২০১৩ : ৩২)

রাজনৈতিক সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে সম্যক অবগত বিশিষ্ট সংগঠক আবুল হাশিম অনেকের মধ্যে শামছুল হককে চিহ্নিত করেন বিশেষভাবে। তাঁর নিজের ভাষায় :

> "শামছুল হক ও শামসুদ্দীন তখন ছাত্র ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আমি নেতৃত্বের গুণাবলী লক্ষ্য করে ভালভাবে তাঁদেরকে চিহ্নিত করি।" (হাশিম, ১৯৮৭ : ৬৪)

প্রথম থেকেই মুসলিম লীগের চিন্তানায়ক তাঁর প্রিয় ছাত্রকে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে গ্রহণ করেন নানা কৌশল। সংগঠন শিখাতে তিনি শামছুল হককে এক গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর সার্বিকভাবে সংগঠন গুছানোর কাজে হাত দেন আবুল হাশিম। তিনি সংগঠন পরিচালনায় কোন বিশেষ গ্রুপ বা একক ব্যক্তির উপর নির্ভর না করে নিয়মিত কর্মী চাঁদা আদায় করার ব্যবস্থা করেন। কাউন্সিলের সভা থাকলেই শামছুল হকের নেতৃত্বে একদল কর্মীকে দায়িত্ব অর্পন করা হয় এই নির্দেশনাসহ যে, শুধুমাত্র চাঁদা প্রদান সাপেক্ষেই প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে, নতুবা নয়। তাঁর ভাষায় :

> নিয়ম অনুসারে পার্লামেন্টারি পার্টির প্রত্যেক সদস্যকে মাসে পাঁচ টাকা হারে চাঁদা দিতে হতো। একবার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল শুরু হওয়ার আগে আইনসভার কক্ষে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তাঁর সম্পূর্ণ বকেয়া চাঁদা আবুল হাশিমের নিকট জমা দেন। কিন্তু সভাকক্ষে ঢোকার আগে শামছুল হকের হাতে সেই চাঁদা তুলে দিতে আবুল হাশিম ভুলে যান। অতঃপর খাজা সভায় হাজির হলে শামছুল হক তাঁকে ঢুকতে

> বাঁধা প্রদান করেন। জনাব হক বলেন যে, স্যার আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করেন নি। নাজিমুদ্দীন বলেন তিনি চাঁদা হাশিম সাহেবের নিকট দিয়েছেন। শামছুল হক করজোড়ে বলেন, " স্যার রেকর্ডে তেমন কিছু নেই যা থেকে বোঝা যায় যে , আপনি বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করেছেন।" বিষয়টি অবহিত হয়ে আবুল হাশিম তড়িঘড়ি করে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে শামছুল হকের নিকট উক্ত চাঁদা জমা দেন এবং তারপরই কেবল তাঁকে ঢুকতে দেয়া হয়। (হাশিম, ১৯৮৭ : ৬০, ৬১)

বাংলায় মুসলমান জমিদারদের অনেকেই মুসলিম লীগের সাথে জড়িত ছিলেন তবে বেশিভাগই শেষ সময়ে। ঢাকার জমিদারগণ সেই অর্থে ব্যাতিক্রম। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। মুসলিম লীগকে তাঁরা পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করতেন। তাঁরা একে নিজেদের বাড়ির মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলেন। কিন্তু আবুল হাশিম এই প্রত্যয় নিয়েই সম্পাদকের দায়িত্ব নেন যে মুসলিম লীগকে বাংলার গণ মানুষের সংগঠনে পরিণত করবেন। শামছুল হকসহ কয়েকজনের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় খাজাদের নাগপাশ থেকে মুসলিম লীগকে উদ্ধারের জন্য। এ উপলক্ষে কামরুদ্দীন আহ্মদ, শামছুল হক, শামসুদ্দীন ও তাজউদ্দীন আহমদ এবং অন্যান্যরা নারায়নগঞ্জের খানসাহেব ওসমান আলীর বাসভবনে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের এক গোপন সভা করার কথা স্থির করলেন। নারায়নগঞ্জের সভা ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থির হয় যে, জেলা কাউন্সিলের সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত কামরুদ্দীন আহ্মদ, শামছুল হক এবং শামসুদ্দীন বামপন্থী সংগ্রামের পরিচালক হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন। খাজা পরিবারের রাজনৈতিক নীতি নির্ধারক খাজা শাহাবুদ্দিন গোয়েন্দা মারফত এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত পূর্বেই জেনে যান। তিনি কামরুদ্দীন আহ্মদ, শামছুল হক ও শামসুদ্দীন আহমদকে ডেকে তাঁর প্রার্থীদের বিজয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণে বাধ্য করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের মূল সংগঠক শামছুল হক প্রস্তাব করলে তা নির্বাচকগণ কোনভাবেই ফেলে দিতে পারবেন না কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া মুসলিম লীগের এই সংগঠকমণ্ডলী, চমৎকার কৌশলে তাঁদের মনোনীত নেতৃবৃন্দকে নির্বাচিত করেন। (হাশিম, ১৯৮৭ : ৮১-৮৩)

আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচনে হারার পর খাজাদের প্রার্থী আব্দুস সেলিম প্রতিক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে চিৎকার করে বলেন তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন আর খাজা শাহাবুদ্দিন কিছু না বলে কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন নিশ্চুপ ((হাশিম, ১৯৮৭ : ৮৪)। এরপর শুরু হয় সংগঠনকে জনগণের দৌরগোড়ায় পৌছানোর কর্মসূচি। দেশের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয় জনসভার কার্যক্রম। সেই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৯৪৪ সালের মাঝের দিকে তিনি টাঙ্গাইল আলিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। চুম্বক বক্তৃতায় তিনি পাকিস্তানের রূপরেখা জানান। উপস্থিত জনতার মনোভাবই প্রমাণ করে তারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন সেই উজ্জীবনী সভায়। (সেন, ১৯৯৭ : ৩৭২)

আবুল হাশিমের নির্দেশনায় প্রধানত শামছুল হকের নেতৃত্বে, সার্বিক কার্যক্রমের ফলে ১৯৪৫ সালের মধ্যে বাংলার বিপুল সংখ্যক মুসলমান মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম লীগ যে কোন সময়ের তুলনায় অধিক শক্তিশালী অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয় এবং বলা যায় গণসংগঠনে রূপান্তরিত হয়। শুধুমাত্র পূর্ব বাংলাই নয় পশ্চিম বঙ্গেও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন শামছুল হক। একবার আবুল হাশিম- সোহরাওয়ার্দী দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ আসামে সোহরাওয়ার্দী-ফজলুল হক এক সভা আহবান করেন, আবুল হাশিমকে না জানিয়ে। যেহেতু এলাকাটি আবুল হাশিমের সেহেতু তিনি এতে ক্ষিপ্ত হন। ময়মনসিংহে সাংগঠনিক সফরে থাকা শামছুল হককে ডেকে নিয়ে আবুল হাশিম এক সপ্তাহের ব্যবধানে এক সফল জনসভা অনুষ্ঠান করেন (কবীর, ১৯৯২ : ২২)। জনসভার পর অবশ্য সোহরাওয়ার্দী-হাশিম মনোমালিন্যের অবসান ঘটে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ভারতের প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোর দ্বিতীয় নির্বাচন ১৯৪৬ সালের ১৯ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ একে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে গণভোট বলে ঘোষণা করে (Ahmad, 1964 : 202)। মুসলিম লীগ, পূর্ব বাংলার নির্বাচনে দশ লক্ষাধিক সদস্য সমবায়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম সংগঠন হিসেবে অংশগ্রহণ করে (শিবলী, ২০০৯ : ৮৮)।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মরিয়া চেষ্টা করে। প্রায় ৯ বৎসর পর অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ছিল ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বিশেষত মুসলিম লীগের জন্য তা পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে জনমত যাচাইয়ের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ছিল সুসংগঠিত শাখা সংগঠন হিসাবে (Hashim, 1984 : 172)। সুতরাং জিন্নাহর ঘোষণাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

১৯৪৬ সালের ১৯শে মার্চ থেকে ২২শে মার্চ পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য করা হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড পুনরায় নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্বের মত এবারও মওলানা আকরম খাঁ স্বাস্থ্য উদ্ধারের অজুহাতে বিহারের মধুপুর চলে যান এবং এম.এ জিন্নাহর নির্দেশে নাজিমুদ্দীন ভারতের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের মনোভাব ও নীতি সম্পর্কে বোঝাপড়া করার উদ্দেশ্যে লন্ডন গমন করেন (আহমদ, ২০১৪ : ৬৭)। অপরদিকে পার্লামেন্টারি বোর্ডের অপর দুই নেতা জনাব ফজলুর রহমান ও নূরুল আমীন স্ব স্ব নির্বাচনী কেন্দ্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী খান নির্বাচনে পূর্বে বাংলায় সফরে এলেও জনমনে তার প্রভাব ছিল অকিঞ্চিতকর (আহমদ, ২০১৪ : ৬৭)।

ফলে এবারও নির্বাচনী প্রচারণার সকল দায়িত্ব আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর উপর অর্পিত হয়। তারা নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে পুনরায় সমগ্র বাংলায় শক্তিশালী ও বিরামহীন প্রচারাভিযান শুরু করেন। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রচার কার্যে অংশ নেয়ার জন্য এ সময় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় ২০ হাজার ছাত্র সারা বাংলা মুসলিম ছাত্রলীগ ও ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী হিসেবে যোগদান করে (*The Star of India*, 20 March, 1946)।

ছাত্রদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে আবুল হাশিমের উদ্যোগে মুসলিম ছাত্রলীগের পৃষ্ঠাপোষকতায় ঢাকা ও কলিকাতায় দু'টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এসময় মুসলিম লীগ হতে নির্দেশনা জারি হয় নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব বুঝে নিতে। জেলায় জেলায় নির্বাচনী অফিস ও কর্মী শিবির খোলার নির্দেশ দিয়ে ভাল কর্মীদের দায়িত্ব নিতে বলা হয় । কামরুদ্দীন, শামছুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমানকে একেকটা জেলার দায়িত্ব নিতে বলা হয় (রহমান ২০১৩ : ৪৫-৪৬)।

নির্বাচনী প্রচারণায় অভিনব সব কৌশলের আশ্রয় নিলেও আবুল হাশিম জনসংযোগ বৃদ্ধিতে সর্বাপেক্ষা কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে নেতৃবর্গকে প্রদেশের প্রতিটি অঞ্চল সফরের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্যগণ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের মফঃস্বল ও শহরাঞ্চলে গড়ে প্রায় ৭০/৮০টি স্থান সফর করেন এবং প্রতিটি স্থানেই আবুল হাশিমসহ পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা করেন। এসময় দেশব্যাপি সফরের একপর্যায়ে শামছুল হক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিশেষত পাবনার জনসভায় তিনি বসে বক্তৃতা করেন (কবীর, ১৯৯২ : ২৮)।

আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী সকল নির্বাচন কেন্দ্র সফরের সিদ্ধান্ত নিলেও যে সব কেন্দ্রে লীগের শক্তিশালি প্রতিপক্ষ ছিল সে সব স্থানে প্রচারাভিযানে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। কর্মীশিবিরের অধ্যক্ষ ও পূর্ববাঙলায় সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনকারী দক্ষ সংগঠক হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই শামছুল হক অতিরিক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং আবুল হাশিম নিশ্চিন্তে পশ্চিম বাংলায় মুসলিম লীগের পক্ষে ভূমিকা পালনে সক্ষম হন (সেন, ১৯৯৭ : ৩৭২)।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ব্যাপক সাংগঠনিক সফরে শামছুল হক ইসলামের আদর্শ, মুসলিম লীগের কর্মসূচি, লাহোর প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা, পৃথক রাষ্ট্রের আবশ্যকতা, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অপকারি দিকসহ স্বাধীনতার দাবীতে অগ্নিঝড়া বক্তব্য তুলে ধরতে থাকেন আবুল হাশিমের সাথে। কোথাওবা প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বে। তাঁর সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনায় পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ার তৈরি হয় (সেন, ১৯৯৭ : ৩৭২)।

মুসলিম লীগের নেতারা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের এই বলে উৎসাহিত করেন যে, কেবলমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেলেই পূর্ববাংলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও উন্নতি হবে। মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে মুসলিম লীগ ঘোষণা করে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পেলে জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হবে, কৃষকদের ভর্তুকি দেওয়া হবে এবং ভাল বীজ প্রদান করা হবে, খাদ্য সমস্যার সমাধান করা হবে, পাটের মূল্য বৃদ্ধি করা হবে, প্রধান প্রধান শিল্পকে জাতীয়করণ করা হবে- যাতে করে জনগণের উন্নতি হয়, বস্ত্র শিল্পকে ভর্তুকি দিয়ে বস্ত্রশিল্পের প্রসার করা হবে, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করে শিক্ষা ব্যবস্থায় হিন্দুদের আধিপত্যের অবসান ঘটানো হবে (রশিদ, ২০০১ : ২০৬, ২০৭)। বস্তুত পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল অশিক্ষিত ও কৃষক শ্রেণীর। এই কারণে মুসলিম লীগের এই নির্বাচনী প্রচারণা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মাঝে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়।

লীগের পাকিস্তান দাবী সর্বস্তরের মুসলমানদের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তা অন্য যে কোন দলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইস্যুকে ম্লান করে দেয়। ফলে ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনের মতই ব্যাপক বিজয় অর্জন করে। প্রাদেশিক পরিষদের সর্বমোট ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৩টি আসনে জয়ী হয়ে আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের এ অসামান্য সাফল্য থেকে মুসলিম লীগ যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং মুসলমানরা যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী লীগের এ দাবীর যৌক্তিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বরাবরের মত সোহরাওয়ার্দী - আবুল হাশিম ও তাদের অনুগত নেতৃবৃন্দের ভুমিকায় কেন্দ্রীয় পরিষদের মত বিপুল বিজয় অর্জন করে।

নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের সাথে সাথে মন্ত্রীমিশনের এই সুযোগ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান ইস্যুকে শক্ত ভিত্তি প্রদানের জন্য ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ৭-৯ এপ্রিল, ১৯৪৬, দিল্লীতে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের একটি সম্মেলন আহবান করেন। ওয়ার্কিং কমিটি কনভেনশনের আলোচ্য বিষয় নিয়ে প্রস্তুতিমূলক কয়েকটি সভায় মিলিত হয়। অতঃপর কনভেনশনের খোলামেলা আলোচনার দিন (৯ এপ্রিল) জিন্নাহর পরামর্শে সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে যে প্রস্তাব পাঠ করানো হয়, তা ছিল লাহোর প্রস্তাবের একটি মৌলিক বিচ্যুতি বা পরিবর্তন :

> That the Muslim nation will never submit to any constitution for a united India and will never participate in any single constitution- making machinery set up for the purpose... That the Zones comprising Bengal and Assam in the North-East and

> the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan in the North-West of India, namely Pakistan Zones, where the Muslims are in a dominant majority, be constituted into a sovereign independent state... That two separate constitution-making bodies be set up by peoples of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing there respective constitutions. (রহমান, ১৯৮২ : ১৫-১৬)।

লাহোর প্রস্তাবের 'independent states' এর স্থলে কনভেনশন প্রস্তাবে 'a sovereign independent state' পরিবর্তন করে দুইটি মুসলিম অঞ্চলে একক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলার প্রতিনিধিদের মধ্যে রক্ষণশীল গোষ্ঠী জিন্নাহর অন্ধ অনুসারী হওয়ায় এ প্রসঙ্গে নিরব ভূমিকা পালন করলেও প্রগতিপন্থী নেতা আবুল হাশিম এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি যুক্তি দেখান যে, মুসলিম লীগের পুর্নাঙ্গ জাতীয় সম্মেলন ১৯৪০ সালে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং ১৯৪১ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে যা মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই প্রস্তাব বাতিল বা সংশোধন করণের এখতিয়ার পরিষদ সদস্যদের নেই। এই প্রস্তাব পরিবর্তন করা যেতে পারে একমাত্র নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শামছুল হক লাহোর অধিবেশনের ন্যায় এ অধিবেশনে পূর্বের চেয়েও পরিপক্ক রূপে অংশগ্রহণ করেন এবং আবুল হাশিম এবং হাসরত মোহানীর সাথে মিলিতভাবে বাংলার স্বাতন্ত্রসহ পৃথক রাষ্ট্রের দাবীতে উচ্চকিত ভূমিকা পালন করেন (আহাদ, ২০১৫ : পৃষ্ঠা ৭১)। আবুল হাশিমের বক্তব্যের প্রতিবাদে ডানপন্থীরা প্রতিবাদ জানাতে থাকলে শামছুল হক বলেন :

> বিগত নির্বাচনে বাংলার মুসলমানরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের মতামত না নিয়ে এই প্রস্তাবের সংশোধন করা ঠিক হবে না। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি (কবীর, ১৯৯২ : ৩১)।

পাঞ্জাবের মিয়া ইফতিখার উদ্দিন, সিন্ধুর জি এম সৈয়দ প্রতিবাদকারীদের অন্যতম ছিলেন (আহমেদ, ২০১৪ : ৭১)।

১৯৪৬ সালে নেত্রকোনার পাগলা গ্রামের বিস্তির্ণ মাঠে নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । কম্যুনিস্ট পার্টি পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিল কাজেই উভয় পতাকা একসাথে উড়ানো হয়। সেই সম্মেলনে হাজার হাজার মানুষের সামনে শামছুল হককে ১০ মিনিট বলতে দেয়া হয়, কিন্তু শ্রোতাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি আধ ঘন্টা বক্তব্য রাখেন (কবীর, ১৯৯২ : ২৯,৩০)। তিনি ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে দাঙ্গা প্রতিরোধে "শান্তি কমিটি" গঠন করেন। তাঁর নিজ জেলা টাঙ্গাইলে কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসর নের্তৃবৃন্দকে নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন (কবীর, ১৯৯২: ২৯,৩০)। ঢাকা ইতোপূর্বে সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা ঝুকিপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও, ঢাকায় কোন ধরণের দূর্ঘটনা ঘটেনি মূলত কর্মী শিবিরের কর্মাধ্যক্ষ শামছুল হক ও ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক শামছুদ্দিন আহমদের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও ভূমিকার কারণে। বলা হয় তাঁদের স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন নেতৃত্বে চরম উত্তেজনাময় এই দাঙ্গার কোন প্রভাব ঢাকায় ছিল না। (আহাদ, ২০১৫ : ১৭)

এইসব দাঙ্গায় লাভ কারো হতে পারেনা, বরং ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অখণ্ড বাংলা আন্দোলন আর পরাজিত হয়েছে মানবতা। কর্মীবাহিনীকে সাথে নিয়ে শামছুল হক এসময় বিশ্রামহীন সময় অতিবাহিত করেন। সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী, ভাষাসৈনিক ও 'সৈনিক' সম্পাদক আব্দুল গফুর সহ বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁদের বর্ণনায় তাঁর বিস্তারিত বিবরণ দেন। ৯৬.৭ ভাগ আসনে জয়লাভের পেছনে সহযোগী অন্যান্যদের সাথে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ ভূমিকা রাখে। নামোল্লেখ না করে বেশকিছু আসনের কথা তাঁরা বলেছেন যেখানে বিজয়ের পেছনে প্রার্থীর চেয়ে শামছুল হকের ভূমিকাই বেশি ছিল। ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের কথা এ প্রসঙ্গে সবার আগে আসবে, কেননা এসব হাতে গোনা আসনের নেতৃবৃন্দ ছাড়া প্রায় সবার ব্যক্তি ইমেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ১৯৪৬ নির্বাচনের পর শুধুমাত্র বাংলায়ই মুসলিম লীগের মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়েছিল আর কোথাও হয়নি। কাজেই পূর্ব বাংলার মুসলিম তরুণ সমাজের মধ্যে যারা তাঁদের শ্রমে এবং ঘামে অভূতপূর্ব সেই বিজয় এনে দিয়েছিল তাঁদের মুল্যায়ন হওয়া জরুরী ছিল। কিন্তু হয়েছিল ঠিক উল্টোটি যা তাঁদের প্রাপ্য ছিল না।

দিল্লি অধিবেশনে মুসলিম লীগ সংশোধিত প্রস্তাবে একক পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বিশেষত হাশিমপন্থীরা এবং যাকে সুচতুরতার সাথে ব্যবহার করে সেই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় সেই সোহরাওয়ার্দী পর্যন্ত হতাশ হন। জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার মাপকাটিতে সোহরাওয়ার্দীর ইমেজকে এক্ষেত্রে সুচতুরভাবে ব্যবহার করা হয়, সেইসাথে পূর্ব-পশ্চিম আঞ্চলিকতার ভেদরেখাও এরমধ্যে শামিল ছিল। বিভিন্ন ঘটনার ডামাডোলে ভারত বিভাগ যখন নিশ্চিত হয়ে যায় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দেশভাগের প্রস্তাবের বাইরে গিয়ে পুরো বাংলাকে এক রাখার প্রশ্নে 'অখণ্ড বাংলা আন্দোলন' প্রসঙ্গে সোহরাওয়ার্দী- আবুল হাশিম কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুর সাথে আলোচনা শুরু করেন ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভৎসতা অনুধাবন করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতীয় জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। সেই সুত্রে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ভারতের নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। তারই প্রচেষ্টায় পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু ঘোষণা করেন যে, অনিচ্ছুক অংশ বাদ

দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেসের আপত্তি নেই। কাজেই ভারত বিভক্তির সম্ভাবনা আঁচ করে এসময় হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষার অজুহাত তুলে বাংলাকে ভাগ করার দাবীতে তীব্র প্রচার শুরু করেন; যদিও মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর বিপরীতে কংগ্রেস ও অন্যান্য হিন্দু সংগঠন অখণ্ড ভারতের দাবীতে দীর্ঘদিন অনড় ছিল। উক্ত দাবীর ভিত্তিতেই কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী বাংলা বিভাগ সমর্থনে মার্চ মাসে (১৯৪৭) প্রকাশ্য বিবৃতি দান করেন। (রশীদ, ২০০১ : ২৫৮)

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে আজাদ হিন্দু ফৌজের মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জীও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন। হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গের এ দাবী সোহরাওয়ার্দী- আবুল হাশিমকে শংকিত করে তোলে। এমতবস্থায় বাংলার অখণ্ডতা বজায় রাখার লক্ষ্যে জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে ভূতপূর্ব প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা সম্পর্কে কোন পূর্ব ঘোষণা দেওয়া হয়নি। গোপন এই সভায় শরৎচন্দ্র বসু প্রতীতি হয় যে, ভারত একটি দেশ নয়, একটি উপমহাদেশ এবং ভারতীয়রা একজাতি নয়। ভারত যথার্থভাবে তখনই স্বাধীন ও স্বার্বভৌম হবে যখন ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি ও জাতিসমূহ স্বাধীন ও সার্বভৌম হবে।

এরপর কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা "স্বাধীনতা" বিষয়টি প্রকাশ করলে রাজনৈতিক মহলে চরম আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় এই বিতর্কের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নেত্রকোনায় দুটি আলাদা সেমিনার অনুষ্ঠান করেন। নেত্রকোনার সেমিনারে কামরুদ্দিন আহম্মদ, শামসুল হক বক্তৃতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী লুলু বিলকিস বাধার মুখে বক্তৃতা দিতে পারেননি (হাননান, ১৯৯২ : ৩৯-৪০)।

শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা নলিনীরঞ্জণ সরকার, সত্যরঞ্জণ বকশীসহ আরও অনেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং কংগ্রেস কাউন্সিলর অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনকে সমর্থন করেন। অতঃপর ২৬শে এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ব্যাপারে বড় লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার জন্য দিল্লী যান। তিনি মাউন্টব্যাটেনকে জানান যে, পরিমিত সময় দেয়া হলে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ব্যাপারে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সহ অন্যান্য নেতৃবর্গকে সম্মত করাতে সক্ষম হবেন এবং সেক্ষেত্রে বাংলার পাকিস্তানভুক্ত হবার প্রয়োজন হবে না। ঐদিনই মাউন্টব্যাটেন সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতামত জানতে চাইলে জিন্নাহ কলকাতাবিহীন বাংলাকে মূল্যহীন বলে উল্লেখ করে অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। (রশীদ, ২০০১ : ২০১)

জিন্নাহর বক্তব্যকে ইতিবাচক ধরে নিয়ে ২৭শে এপ্রিল এইচ এস সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন, সার্বভৌম ও অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগের কথা ঘোষণা করেন এবং পর দিন কলকাতায় ফিরে আসেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী 'স্বাধীন বাংলা' পরিকল্পনা ঘোষণা করেন । এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, বাংলায় এক নতুন মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হবে যার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান । মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যের শতকরা পঞ্চাশভাগ মুসলমান ও বাকী পঞ্চাশভাগ অমুসলমান থাকবেন। এরপর প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে পরিষদ নির্বাচিত হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঘোষণার পর বাংলায় এর স্বপক্ষে জনমত ও আন্দোলন সংগঠনের জন্য নেতৃবর্গের নিকট আবুল হাশিম ও তাঁর কর্মীবাহিনীর সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। আবুল হাশিম সানন্দচিত্তে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ২৮ এপ্রিল তার অনুগামী যুবনেতাদেরও কলকাতায় আসার নির্দেশ দেন। অখণ্ড বাংলার দাবীতে সেই সভায় অংশগ্রহণের জন্য তফসিলি সম্প্রদায়ের মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ইত্তেহাদের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞা, অল স্টুডেন্টস লীগের প্রাক্তন সম্পাদক নুরুদ্দিন আহম্মদ, শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্ব বঙ্গ মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের নেতা শামছুল হক, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক শামসুদ্দিন আহমদ সহ অনেকেই অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৪০ নং থিয়েটার রোডের বাসভবনে এক সভায় মিলিত হন (আহাদ, ২০১৫ : ৩০)। ২৯শে এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সংবাদপত্রে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রকৃতি কেমন হবে সোহরাওয়ার্দী সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান না করলেও আবুল হাশিম হিন্দুদের উদ্দেশ্যে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং প্রশাসনে তাদেরকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জণ দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩) অনুযায়ী সংসদে ৫০ : ৫০ আসন প্রদানের কথা ঘোষণা করেন *(সাপ্তাহিক মিল্লাত*, ২ মে, ১৯৪৭)।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জওয়াহের লাল নেহেরু ৩রা জুন এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ৫ই জুন পরিকল্পনাটির প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাদের এ সম্মতি চূড়ান্তভাবে গৃহিত হওয়া কংগ্রেস ও লীগ কাউন্সিলের সমর্থনের শর্তসাপেক্ষ ছিল। এই উদ্দেশ্যে ৯ই জুন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দিল্লীতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন। জিন্নাহ পরিকল্পনাটির ব্যাপারে কাউন্সিলরদের মতামত জানার জন্য প্রস্তাবটিকে ভোটে দিলে আবুল হাশিমসহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলরদের মধ্যে মাত্র ১১ জন এর বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন। ফলে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাটি মুসলিম লীগ কর্তৃক

বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। ১৪ই জুন কংগ্রেস অধিবেশনেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। (হাশিম, ১৯৮৭ : ১৮৩)

এভাবে বাংলা দ্বিতীয়বার বিভাজিত হয়। বাংলার দুটি বিভাজন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দুটি বিভাজনের ক্ষেত্রেই সুবিধাবাদী গোষ্ঠির চরিত্র এক, তাঁরা পক্ষে বা বিপক্ষে ভূমিকা পালন করে ব্যক্তিগত সুবিধার কথা চিন্তা করে। নইলে প্রথম বঙ্গভঙ্গের সময় প্রদেশ বিভাগের মত একটি সুনির্ধারিত কার্যক্রমকে যে গোষ্ঠী বাতিল করেছিল বঙ্গমাতার বিভাজনকে মেনে না নেয়ার কথা বলে দ্বিতীয়বার তাঁরা শুধু ভাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি রক্তপাতও ঘটিয়েছে। পক্ষান্তরে অপর গোষ্ঠী কোন যায়গায়ই প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণান্ত হতে হয়েছে প্রগতিপন্থীদের, আর শামছুল হক তাঁদেরই দলে। শামছুল হককে মূল্যায়ন করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন :

> পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর অবদান যারা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বাংলাদেশে যে কয়েকজন কর্মী সর্বস্ব দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করেছে তাঁদের মধ্যে শামছুল হক সাহেব সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মী বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না (*রহমান*, ২০১৩ : ২৩৬, ২৩৭)।

অখণ্ড বাংলা আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর শুরু হয় পাকিস্তানের সীমান্ত নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা। সিলেট অঞ্চল পাকিস্তানের না আসামের অর্ন্তভূক্ত হবে সে প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। Sylhet Referendum, the date for the holding the referendum in Sylhet was fixed on the 6th and 7th July 1947. The referendum became necessary to decide whether Sylhet would go to east Bengal with remain within Assam, a province of India. (চৌধুরী, ২০১২ : ৬৬)

স্বাভাবিকভাবেই কর্মী শিবিরের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। আর এতে শামছুল হক রাখেন প্রধান ভূমিকা। শেখ মুজিবুর রহমান সিলেট গণভোটের স্মৃতিচারণ করে বলেন, দানবীর আর পি সাহার অর্থায়নে কয়েকটি লঞ্চ কর্মীদের বহন করে সিলেট গণভোটের প্রচারণার কাজে সিলেট গমন করে। বিশাল কর্মীবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন শামছুল হক স্বয়ং (রহমান, ২০১৩: ৭৬)। অধিক পরিশ্রমের কারণেই হয়তো নির্বাচনে বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে (চৌধুরী, ২০১২: ৬৬) করিমগঞ্জকে আসামের অর্ন্তভূক্ত হওয়ায় শামছুল হক শিশুর মত কেঁদেছিলেন (সিদ্দিকী, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)।

উপসংহার :

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য লাহোর প্রস্তাব ছিল আন্দোলনের দিক নির্দেশক, কিন্তু মাঠে ময়দানে এক বাস্তবায়ন করে সংগঠনের নেতা কর্মীগণ। সংগঠনকে জনসম্পৃক্ত করতে যে সমস্ত সংস্কার কর্মসূচি ও নব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল পূর্ব বাংলায় সেই

সংস্কারের জন্য স্থাপিত হয়েছিল কর্মী শিবির। শামছুল হক সেই কর্মী শিবিরের প্রধান ছিলেন। সাম্প্রদায়িক সংঘাত এড়ানো, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপক কর্মোদ্যোগ, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন, স্বাধীন অখণ্ড বাংলার আপাত ব্যর্থ পদক্ষেপ, সম্বৃদ্ধ সিলেট অঞ্চলকে পাকিস্তানে অর্ন্তভূক্তির আন্দোলনে আংশিক বিজয় সহ সার্বিক ক্ষেত্রে শামছুল হক ছিলেন পূর্ব বাংলা অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি।

তথ্যসূত্র ও টিকাঃ

Ahmad, Jamiluddin, *Speeches and Writings of Mr. Jinnah*, Vol. II, 1964, Dhaka.

Hashim, Abul, *In Retrospection*, 1984, Dhaka.

Muslim League Legislators Convention, Vol. 280, part II, উদ্ধৃত, Rashid, Harun-or-

Philips, C H (edi) *The Evolution of India and Pakistan 1858-1947*, Select Document 1962, London.

Salim, Dr. Mohammad and other (Edi) *Religion and Politics: South Asia, International Public Lecture Series and Conference Souvenir* অন্তর্ভূক্ত Ahmed, A. F Salahuddin, Quest for Peace and harmony in South Asia, Bangladesh Itihas Sammilani, October 2013, Dhaka.

Sen, Shila, *Muslim Politics in Bengal1937-47*,1976, New Delhi.

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৬, ঢাকা।

আহমেদ, কামরুদ্দিন, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* মাওলা ব্রাদার্স, জুন ২০১৪, ঢাকা।

আহাদ, অলি, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, নভেম্বর ২০১৫, ঢাকা।

কবীর, হুমায়ুন, *স্বাধীকার আন্দোলনে শামসুল হক*, শামছুল হক ফাউন্ডেশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ ঢাকা।

চৌধুরী, রব্বানী, *সিলেটের ইতিহাস সমগ্র*, গতিধারা ফেব্রুয়ারি ২০১২, ঢাকা।

নেহরু, জওহরলাল, *আত্মচরিত*, রাবেয়া বুকস, একুশে বইমেলা ২০১৪, ঢাকা।

মিল্লাত, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৭, কলকাতা ।

রশিদ, ড. হারুন-অর-, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০১, *পূর্বোক্ত*, ঢাকা।

রহমান, শেখ মুজিবুর, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল, মার্চ ২০১৩, ঢাকা।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র*, ১ম খন্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, ঢাকা।

শিবলী, আতফুল হাই ও রহমান, মো. মাহবুবুর, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস* ১৭৭৩-১৯৭২, সুবর্ণ, একুশে বইমেলা ২০০৯, ঢাকা।

সিদ্দিকী, ড. আশরাফ, উপেক্ষিত নায়ক, সাহিত্য সাময়িকী, *দৈনিক ইত্তেফাক*, অর্ন্তগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

সুলতানা, আরিফা, "*আবুল হাশিম : কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন*", এম.ফিল. থিসিস (অপ্রকাশিত), ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ১৯৯৬, ঢাকা।

সুলতানা, আরিফা "বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গণতন্ত্রায়নে আবুল হাশিম", অন্তর্গত, A.T.M Atiqur Rahman (edi.) Clio, Journal of History Department, Jahangirnagar University, Vol xiv June 1997, Dhaka ।

সেন, কামাক্ষা নাথ, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও টাঙ্গাইল, অ মুহম্মদ বাকের (সম্পা.) *টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ঐতিহ্য*, টাঙ্গাইল: জেলা পরিষদ, এপ্রিল ১৯৯৭, টাঙ্গাইল।

হক, আবুল কাসেম ফজলুল, *বাংলার জাগরণ*, কথা প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, ঢাকা।

হাননান, ড. মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২, ঢাকা।

হাশিম, আবুল, *আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, নওরোজ কিতাবস্তান, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, ঢাকা।

[**Abstract:** In almost every case during the colonial rule, the seeds of distrust and conflict sown by the people of the two major religions of India at that time were sown by the English power, which eventually turned into a bloody conflict. Shamsul Haque was among those who played a role in getting rid of these untoward incidents {Shamsul Haque (1918-1965)) played a role in getting rid of them. A wonderful Bengali politician. Born in the village of Mythine in present-day Delduar upazila of Tangail, this political leader took elementary-secondary education with credit to various institutions of the Delduar and Sadar Tangail, including Saadat College. As a member of a politically conscious family, he became involved in the socio-political spheres from his school life, and after becoming admitted to the history department of Dhaka University, his life became a livelihood. He was one of the leading organizers of all the movement struggles in the political life of the present Dhaka's great-grandson. He is an elected member of the Constituent Assembly of Pakistan, the founding president of the Democratic Jubo League, and the founding general secretary of

the Awami Muslim League, whose changed identity is Awami League. What made the Muslim League in East Pakistan a mass organization was that of the activist, who was his soulmate. From this activist of 150 Mogultuli, the Chhatra League was born later. The Muslim League formed a single government in East Pakistan, only in the whole of India, under the leadership of Shamsul Haque, mainly in the workforce. The Muslim League ruled in the Provincial Assembly elections of 1945, receiving about 90% of the votes cast, and Jinnah was able to establish the Muslim League as a representative party of the Muslim League because of the victory of the Muslim League in almost all the Muslim-dominated seats. Despite strong opposition from the Jamiate ulamae Hind in the land, the Sylhet territory, which was a part of the partition of India, was part of Pakistan's working class. In the current political reality of Bangladesh, the evaluation of a political person like Shamsul Haque appears to be very important]. However, he was not mature enough in terms of age and experience. The Muslim League was introduced to the next role in the subsequent politics through the proposal of Lahore 1940. Fortunately, Shamsul Haque also played an important role as a youthful Muslim leader in crossing the age limit, starting from this period as a progressive part in the overall functioning of the Muslim League organization, elections and establishment of Pakistan. He played a leading role in all aspects of the Pakistan movement, including the Unbroken Bangla Movement, the protection of communal harmony, the Assam Ganovote. Shamsul Haque, who played a key role in the then East Bengal Muslim League movement in the movement for the establishment of Pakistan, is one of the top organizers of Dhaka-centric politics following Abul Hashim.]